সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 58 | No. 1-2 | 2023

Check for updates

আল মাহমুদের ছোটগল্প : ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আলোকে

Volume	58
Issue	1-2
Year	2023
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Momenur Rasul
Published online	February 1, 2023
DOI	10.62328/sp.v58i1-2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v58i1-2.5
Pages	৮৭-১০৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আল মাহমুদের ছোটগল্প : ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আলোকে

মোমেনুর রসুল*

সারসংক্ষেপ: পঞ্চাশের দশকের কবি আল মাহমুদ কবিতার পাশাপাশি লিখেছেন কথাসাহিত্যের জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম উপন্যাস ও ছোটগল্প। গল্পকার আল মাহমুদের সক্রিয় আবির্ভাব ঘটে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় বক্তব্য পরিবেশন ও প্রকরণ সৌকর্যের নান্দনিকতায় তাঁর গল্প স্বতন্ত্র। সমাজ ও মানুষের চিত্তবৃত্তির বহুমাত্রিক প্রসঙ্গ আল মাহমুদের ছোটগল্পে পরিবেশিত হয়েছে আন্তরিক বিশ্বস্ততায়। বস্তুত নর-নারীর যৌনজীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা আল মাহমুদের ছোটগল্পকে দিয়েছে বিরল স্বাতন্ত্র্য; যা বর্তমান আধুনিক শিল্পের উল্লেখযোগ্য বিষয়। আধুনিক জীবনকে যথাযথরূপে উপস্থাপনের নিমিত্তে নর-নারীর যৌন চেতনাকে তিনি নন্দনতাত্ত্বিক প্রকরণ-পরিচর্যার মাধ্যমে গল্পে চিত্রিত করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আলোকে আল মাহমুদের ছোটগল্পে বিধৃত নর-নারীর সম্পর্কের স্বরূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

আধুনিক জীবনের নানামুখী সংকট মানুষকে জটিল আবর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করায় সেই জটিলতা তার মনের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। কথাসাহিত্যে বিশেষত ছোটগল্পের ন্যায় দৃঢ়পিনদ্ধ শিল্পে তাই মানবমনের অপার রহস্যের দ্বার উন্মোচনের প্রয়াস দুর্লক্ষ্য নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে, মহাকাব্য বা আখ্যানধর্মী রচনাসমূহের মধ্যে মানবসম্পর্ক ও তার মনোজগতের যে স্বরূপ উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে সমাজবাস্তবতার সঙ্গে ধর্ম, মূল্যবোধ, প্রথা এবং সংস্কার লেখকদের মন-মানস অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে। সেখানে মানুষের জৈবিক সম্পর্কের বিষয়টি ছিল সূক্ষ্মতাবর্জিত, স্থূল ও একরৈখিক – মনের জটিল প্রান্তগুলো তার বিচিত্র রূপ নিয়ে তাতে উপস্থাপিত হয়নি। আধুনিক যুগে যখন কথাসাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে, তখন থেকেই মানুষের মন ও মনোজগতের অন্তরস্থ বিষয়সমূহ লেখকদের কাছে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্যায়ে মানবমনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত সিগমন্ড ফ্রয়েডের[১] (১৮৫৬-১৯৩৯) যুগান্তকারী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৭০) অভিমত এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য:

> মনস্তাত্ত্বিক শাখাটিও ছোটগল্পের অন্যতম মুখ্য সমৃদ্ধি। এর বিকাশকে সবচাইতে আনুকূল্য করেছেন মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড। গল্পসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে ফ্রয়েডবাদের বিশেষ একটি ভূমিকা রয়েছে। এ যুগে এই পর্যায়ী গল্পেই লেখকের শক্তি পরিমাপ করা হয়ে থাকে। (নারায়ণ, ১৪০৫: ২০৯)

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মানবমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রবণতাগুচ্ছের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ফ্রয়েড ছিলেন অনন্য। বস্তুত মনোবিশ্লেষণসূত্রে মানবমনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত যে অভিসন্দর্ভ তিনি উপস্থাপন করেছেন তা মানববিদ্যার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ফ্রয়েডই প্রথম আবিষ্কার করেন মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের নেপথ্য চালিকাশক্তি তার অবচেতন মন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির অধীন নয় – মানুষের ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় অবচেতন মনের গভীরে সুপ্ত অন্ধকার গুহাবাসী এক প্রবল জৈবিক শক্তির মাধ্যমে। ফ্রয়েডের এ বক্তব্য আধুনিক যুগের কথাসাহিত্যিকদের চেতনামূলে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়েছে। পুরনো বিষয় ও চিন্তাধারাকে নস্যাৎ করে নতুন মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির বিজ্ঞাননির্ভর এ ব্যাখ্যা শিল্পে-সাহিত্যে তো বটেই, উত্তরকালে ফ্রয়েডের শিষ্য আলফ্রেড অ্যাডলারের (১৮৭০-১৯৩৭) *The Practice and Theory of Individual Psychology* (১৯২৪) ও কার্ল গুস্তাভ ইয়ুঙের (১৮৭৫-১৯৬১) *The Essays on Analytical Psychology* (১৯২৮)-র মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। আধুনিক কথাসাহিত্যে মানবমনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহারে সাহিত্যিকদের আগ্রহ লক্ষ করা যায়। সমালোচকের মতে:

> সামাজিক জীবনে ও লোক ব্যবহারে পরিচিত খণ্ড-মানুষের এই পূর্ণাঙ্গ সত্তাকেই আবিষ্করণের প্রয়াস শুরু হয়েছে। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের যত সংযোজন ও পরিমার্জনই হোক না কেন সেখান থেকেই বর্তমান যে মনোগহনের দীপবর্তিকা লাভ করেছে তাতে মতদ্বৈধ নেই। (নারায়ণ, ১৪১০: ৬০)

ফ্রয়েড তাঁর গ্রন্থসমূহে[২] মনঃসমীক্ষণধর্মী তত্ত্ব ও দর্শন উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারাৎসার হচ্ছে: মানুষের মনের জগৎ দুটি স্তরে বিভক্ত – একটি চেতন, অপরটি অবচেতন। মানবমনের তিন চতুর্থাংশ বা তার বেশি অংশ জুড়ে ক্রিয়াশীল অবচেতন মন যার ওপর তার নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। অথচ এ অবচেতন মনই মানুষের সকল কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিমুহূর্তেই। মানুষের অবচেতন মনে বা মগ্ন চৈতন্যে একচ্ছত্র অধিষ্ঠান কাম, ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি রিপু। মানবমন যুক্তি দ্বারা চালিত নয়, কারণ সে তার ইচ্ছাশক্তির কর্তা নয়। মানুষের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার মনের অবচেতনলোকের অন্ধকারে সুপ্ত থাকা জৈবিক শক্তি দ্বারা। 'বাজিকর যেমন পর্দার আড়ালে বসে অদৃশ্য সূতার সাহায্যে পুতুলদের নাচায়, তেমনি করে এক অন্ধ জৈবিক শক্তি মানুষ-পুতুলদের নাচিয়ে বেড়াচ্ছে।' (অচ্যুত, ১৯৬৮: ৩৫৯) মানুষের জীবনে মাত্র দুটি প্রবৃত্তি আছে: জৈবিক প্রবৃত্তি ও বংশ প্রবৃত্তি – যা নিবৃত্তির জন্য মানুষ নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যায়। মানুষের মনের ভেতর দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি কাজ করে – একটি জীবনমুখী, অপরটি মৃত্যুমুখী। জীবনমুখী শক্তিটির নাম ফ্রয়েডীয় প্রত্যয় অনুযায়ী 'এরস' (Eros) এবং মৃত্যুমুখী শক্তিটির নাম 'থ্যানাটস' (Thanatos)। আত্মরক্ষা (Self-Preservation) এবং বংশবৃদ্ধি (Re-production) এ দুটি প্রধান প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে

জীবনমুখী শক্তির বিকাশ ঘটে। 'আমরা যত রকম কাজ করি না কেন, তার মধ্যে এই দুটি প্রবৃত্তিই প্রকাশ পায়।' (সুনীলকুমার, ১৯৯০: ১৫) এই 'এরস'কে ফ্রয়েড বলেছেন 'লিবিডো'। লিবিডো হচ্ছে কাম তাড়না যা নারী-পুরুষের যৌথ আকর্ষণের মূলে সর্বদা বিচরণশীল। 'কামচেতনার বিকাশ কোনো একটি ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না' (জহর, ২০১৯: ৪৯) ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর পরিধি অনেক বিস্তৃত। সাধারণ অর্থে লিবিডো যে অর্থ প্রকাশ করে, ফ্রয়েডে তার অর্থ অনেক সম্প্রসারিত। সাধারণ অর্থে লিবিডো যৌন কামনা-বাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ফ্রয়েডীয় প্রত্যয় অনুযায়ী যে কোনোরকম আকর্ষণকেই লিবিডো বলা যায়। তিনি দেখিয়েছেন যৌন আকর্ষণ থেকেই মানুষের সমস্ত আকর্ষণের উৎপত্তি ঘটে।

সিগমন্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণের যে ভাষ্য নির্মাণ করেন, তাতে মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে তিনটি মূল স্তর কল্পনা করা হয়েছে: ইদ বা অহম বা অন্ধ প্রবৃত্তি (iD), ইগো বা অহং বা সামাজিক চেতনা (ego) এবং সুপার ইগো বা অধিসত্তা বা বৌদ্ধিক চেতনা (Super ego)। এ সত্তাগুলো যথাক্রমে মনের অবচেতন (un-conscious), প্রাক-চেতন (pre conscious) এবং চেতন (conscious) স্তরে অবস্থান করে। মানবমনের এই ত্রিস্তরের মধ্যে আদিম মন (id) সবচেয়ে শক্তিশালী। এর লক্ষণ দুটো: ক্ষুধা-পিপাসা ও রিরংসা। শিশুর বয়োবৃদ্ধি, পরিবেশ-সচেতনতা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় ইগো বা অহং। ইদম পর্যায়ে মনের প্রবৃত্তি থাকে অনুশাসনমুক্ত; কিন্তু পরিবেশ-সচেতনতার কারণে যে অহং-স্তরের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে ইদমের ঘটে তীব্র বিরোধ। এ বিরোধ হচ্ছে আদিম সত্তার সঙ্গে নৈতিক সত্তার বিরোধ। মানবমনের চূড়ান্ত বিকাশকে বলা হয় সুপার ইগো। একে বিবেকের সঙ্গে তুলনা করা যায় অনায়াসে। এটি হচ্ছে সেই মার্জিত অহং, যা মনোবিবর্তনের সর্বশেষ স্তর এবং যা শাসন করে ইদম ও ইগোকে। তিন স্তরে বিভক্ত মানবমনের প্রথম স্তর হচ্ছে দুর্জ্ঞেয়; কিন্তু মনের এ দুর্জ্ঞেয় প্রদেশ নির্জ্ঞান স্তরের শক্তি প্রবল; এবং সে-শক্তিকে ফ্রয়েড বলেছেন যৌনতাত্ত্বিক মূল প্রাণশক্তি বা লিবিডো। মানবমনের ইগো-সুপার ইগোর সঙ্গে ইদমের দ্বন্দ্ব সার্বক্ষণিক। এ দ্বন্দ্ব প্রধানত সচেতন বিবেকাংশের সঙ্গে অবচেতন নির্জ্ঞানের দ্বন্দ্ব। ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, সচেতন মনের সঙ্গে লিবিডোকেন্দ্রিক ইদমের দ্বন্দ্ব যেমন যাবতীয় বিকারগ্রস্ততা, অস্বভাবী আচরণ, স্নায়ুব্যাধির প্রধান কারণ, তেমনি ইদম স্তরের এ লিবিডোই মানুষের সকল সক্রিয়তা ও উদ্যমের সংগোপন উৎস। লেখা বাহুল্য, ফ্রয়েড ব্যক্তির যৌন মনস্তত্ত্বের যে অজানা রহস্যকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে উন্মোচন করেছেন তারই বৈচিত্র্যময় স্বরূপ আল মাহমুদের[৩] (১৯৩৬-২০১৯) কয়েকটি গল্পে মুখ্য হয়ে উঠেছে। অবচেতনা অন্তর্গত তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়জ-প্রবৃত্তি, তার আলো-আঁধারি রূপ, দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা এবং তার বিনাশী শক্তি – যা প্রাত্যহিক নরনারীকে কখনো কখনো তাড়িত করে অস্বভাবী মনোবৃত্তিতে, তাকে নিক্ষেপ করে অন্ধকার কূপে, সেই কামনাজর্জর দেহজ বাসনানির্ভর চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে

আল মাহমুদের বেশ কিছু গল্পে। বস্তুত 'আল মাহমুদের অনেক গল্পে মানবজীবনের এই লিবিডো চেতনা শৈল্পিক রূপ লাভ করেছে।' (ইয়াহ্ইয়া, ২০২০: ৬৭) এ প্রসঙ্গে চঞ্চল কুমার বোস বলেন:

> মধ্যবিত্তের নাগরিক দুঃখ কিংবা সুখবিলাসের কাহিনি নয়, আল মাহমুদ প্রবেশ করেছেন যৌন-মনোলোকের গহীন প্রদেশে। সেই জীবনকে আমরা ঢেকে রাখি মানবীয় ভব্যতা দিয়ে কিন্তু লিবিডোচেতনা আমাদের অস্তিত্বের এক সার্বভৌম জায়গা যাকে জীবন থেকে বাদ দেয়া যায় না। এই লিবিডোজগৎ আমাদের দেহের মধ্যেই যেন অন্য এক প্রবাস। জীবনের সঙ্গে প্রবলভাবে যুক্ত বলে এবং শিল্পের দারুণ পরিচর্যায় বিম্বিত হয়েছে বলেই এই গল্পগুলো কথাকার হিসেবে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে স্বতন্ত্র উচ্চতায়। (চঞ্চল, ২০১৬: ১৯২-১৯৩)

লিবিডোচালিত মানবচৈতন্যের বহুমাত্রিক প্রান্ত উদ্ভাসিত হয়েছে আল মাহমুদের 'পানকৌড়ির রক্ত', 'কালো নৌকা', 'রোকনের স্বপ্নদোলা', 'জলবেশ্যা', 'বুনো বৃষ্টির প্ররোচনা', 'মাংসের তোরণ', 'খনন', 'মীর বাড়ির কুরসিনামা', 'ঈভের ছায়া', 'নিলক্ষ্যার চর', 'পুরুষ সুন্দর', 'দৌড়' গল্পে। এসব গল্পে নরনারীর যৌনজীবনের কারুময় দিক বর্ণিত হয়েছে স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায়।

শিল্পচৈতন্যের নানা দিক থেকে আল মাহমুদ তাঁর গল্পের ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। মোট পাঁচটি গল্প নিয়ে আল মাহমুদের সর্বপ্রথম গল্পগ্রন্থ *পানকৌড়ির রক্ত* (১৯৭৫) প্রকাশিত হবার পর পাঠক ও সমালোচকমহলে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়। আল মাহমুদ তাঁর স্বকীয় চিন্তা-চেতনার গভীরতায় নির্মাণ করেছেন এক-একটি গল্প যা স্রোতের মতো পাঠক মস্তিষ্ককে দ্রুত নিয়ে যায় অন্য এক জগতে। গল্পগুলোর বিষয়-পরিকল্পনা ও পরিবেশনায় যৌনতা একটি প্রধান অংশ অধিকার করেছে। নরনারীর প্রবৃত্তি অন্তর্গত যৌন চাহিদাকে গল্পকার সংগুপ্ত না রেখে বরং জীবনের এই অপরিহার্য দিকটিকে বেশ উৎসাহের সঙ্গে রূপদান করেছেন আলোচ্য গ্রন্থের গল্পসমূহে। ফলে এ গল্পগ্রন্থে নরনারীর বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের চেয়ে তাদের অন্তর্জগাতের গতিপ্রকৃতিই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

আল মাহমুদের শিল্পী চৈতন্যে অবচেতনভাবে লিবিডোর প্রভাব থাকায় 'পানকৌড়ির রক্ত' গল্পে তার বৈচিত্র্যময় প্রকাশ ঘটেছে। একটি শিকার-কাহিনির প্রতীকে গল্পকার এখানে মুখ্য চরিত্র আদিনা-আনোয়ারের লিবিডোতাড়িত জীবনের রক্তিম অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। পূর্ব-পরিচিত আদিনা-আনোয়ারের সদ্য বিবাহিত জীবনে আদিনার শরীরী উপস্থিতি আনুর মনোজগাতে যে তীব্র আবেগময় আলোড়ন ও ইন্দ্রিয়জ কামনার সৃষ্টি করে তার অনন্য প্রতীকী উপস্থাপনা ঘটেছে এ গল্পে। গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে অবকাশ যাপনে কালো রঙের পানকৌড়ি শিকার করতে গিয়ে শুরু থেকেই আনোয়ার অনুভব করে 'কোথায় যেন আদিনার সাথে পাখিটার একটা মিল আছে'। (আল, ১৯৯৭: ১১) আদিনার মায়াময় কালো গায়ের রঙ কিংবা পানকৌড়ির উড়ন্ত ভঙ্গির সঙ্গে আদিনার

দু-বাহু মেলে স্বামীকে জড়িয়ে ধরার ক্রমসাদৃশ্য আবিষ্কার করতে গিয়ে শিকারের চূড়ান্ত মুহূর্তে গুলি খেয়ে যখন প্রাণবন্ত পাখিটা সবুজ জলের পটভূমিকায় নিজেরই রক্তে লাল হয়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে তখন আনোয়ার যন্ত্রণাদায়ক এক বর্ণের সমারোহে স্তম্ভিত হয়ে যায়। স্ত্রী আদিনার সঙ্গে প্রথম সহবাস রাত্রির অভিজ্ঞতাজাত কল্পচিত্রটি তার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ভেঙে এক হয়ে যায়:

> একটি শ্যামবর্ণ নারীশরীর নদীর নীলিমায় আপন রক্তের মধ্যে তোলপাড় করছে। মনে হলে, আলোকিত এই মুখ, বাহু, বুক ও যুগল-উরু আমার চেনা। আমি আদিনার নাম ধরে নদীর দিকে ডাক দিতে গেলে দেখলাম সেই অঙ্গশোভা ঢেউয়ের ছলছলানি তুলে ডুবে যাচ্ছে। আমি বন্দুকের গরম নলে গাল চেপে অসহায়ের মতো বসে রইলাম। বারুদের গন্ধে আমার চারপাশটা ভরে যেতে লাগল। (আল, ১৯৯৭: ২২)

উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত আলোচ্য গল্পের প্রারম্ভে পানকৌড়ির ভঙ্গিতে আনোয়ার দেখেছিল জীবিকা বিজয়ীর দর্প আর গল্পের শেষে সে নিজেই জয়ী শিকারী। প্রথম সহবাস রাত্রির পরে বিজয়ী শিকারীর গর্বে গর্বিত হয়ে ওঠে পুরুষও। বিজিতা নারীর প্রথম রক্ত তাকেও দেয় বিজয়ীর পরিতৃপ্তি। আনোয়ার পেছন দিক থেকে শিকারে আগ্রহী হয় না। গল্পকারের ভাষায়:

> সম্ভবত শিকারের মুখোমুখি না হলে বারুদ-বর্ষণকারীরা কোনও আনন্দ পায় না। বীর্য-বর্ষণকারীদেরও যেমন রমণলিপ্তা নারীর মুখমণ্ডল, বাহুমূল, স্তনযুগলের প্রত্যক্ষতা অবলোকন ও পেষণের প্রয়োজন অবধারিত হয়ে ওঠে, কারণ এসব উপাচারের স্বতঃস্ফূর্তি রক্তকে মথিত করলে পুরুষের শরীর একটা নিক্ষেপনীতিতে ঋজু হতে হতে এক অন্তরালবর্তী পুলকময় সত্তাকে নির্গলনে বাধ্য করে। (আল, ১৯৯৭: ১৪)

গল্পে পানকৌড়ি হয়ে উঠেছে লিবিডোর প্রতীক। এক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় মতবাদের সঙ্গে আল মাহমুদের রূপক-প্রতীক চেতনা অভিন্নসূত্র স্থাপন করেছে। বারুদ বর্ষণকারীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে বীর্যবর্ষণকারীদের নিয়মকানুন যেভাবে গল্পে পরিবেশিত হয়েছে; তাতে মনে হয় লেখকের এ বর্ণাঢ্য বর্ণনার অন্তরালে কাহিনি নয়, বরং যৌন মনস্তত্ত্বের কোনো বিষয় উপস্থাপন করার ইচ্ছাই ক্রিয়াশীল থেকেছে। এখানে পানকৌড়ি আর আদিনা সমার্থক হয়ে উঠেছে। আনোয়ারের রিরংসা প্রবৃত্তি সহিংস হয়ে তৎপর হয়েছে গল্পে পানকৌড়ি পাখিটাকে মারার মধ্য দিয়ে। এছাড়াও দুই শ্যালিকা মদিনা আর সখিনার অন্তরঙ্গ কিশোরীসুলভ আচরণ আনুকে যৌনভাবনায় বিভোর করে তোলে। মদিনা আর সখিনার বালখিল্য আচরণে আনুর মনে হয়:

> পৃথিবীর ম্যাপের মধ্যে এশিয়ার যোনির মতো দেখতে সবুজ গুল্মলতায় ঘেরা একটি বদ্বীপে, যেখানে জলো-বাতাসে নিশ্বাস টানতে টানতে কিশোরীরা মাত্র ন-বছরেই শরীরের সমস্ত গিঁরো উন্মোচন করে বেড়ে ওঠে। (আল, ১৯৯৭: ১৫)

সদ্য কিশোরী মদিনা ও সখিনার কচি সুপারির মতো ছোট বুক আর চিবুকের চাপ কামতৃষ্ণার্ত আনুর যৌন উন্মাদনা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এই উত্তেজনাকর অবস্থায় আনু পানকৌড়ি পাখিকে গুলি করে এবং পানকৌড়ির মৃত্যু হয়। পানকৌড়ির মৃত্যুকে এখানে উপমিত করা হয়েছে আনুর অবদমিত যৌন চাহিদা উপশমের প্রতীক হিসেবে। এখানে আনোয়ার চরিত্রের মধ্য দিয়ে আল মাহমুদ প্রেম আর বোধের তীব্র বিপর্যয় চিত্রায়িত করেছেন। বন্দুকের গুলিতে পানকৌড়ি পাখিকে বিদ্ধ করার প্রতীকে আল মাহমুদ কামতপ্ত আনু কর্তৃক আদিনাকে সম্ভোগের যে অনুপুঙ্খ ছবি গল্পে চিত্রিত করেছেন তা এক কথায় অনবদ্য ও বিস্ময়কর। 'যৌন ঈপ্সা, প্রকৃতিচিত্রণ, নারীর প্রতীকী উপস্থাপন, কাব্যময়তা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে *পানকৌড়ির রক্ত* আমাদের ছোটগল্পের ভাণ্ডারে এক অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি।' (হাসান, ২০১৭: ১৪৭)

'পানকৌড়ির রক্ত' গল্পের মতো 'কালো নৌকা'[৫] গল্পেও নর-নারীর লিবিডোনির্ভর অপ্রতিরোধ্য যৌনকামনা আর জৈবিক বাধ্যবাধকতার অপূর্ব সমাবেশ লক্ষ করা যায়। গল্পটি সমুদ্র উপকূলসংলগ্ন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জলদাসদের জীবন নিয়ে রচিত। ফৌজদারহাটের সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণ করতে আসা দর্শনার্থীদের বর্ণনা দিয়ে লেখক গল্পের পট উন্মোচন করেন:

> মেয়েরা শাড়ি টেনে গোড়ালি উদোম করে হাঁটছিল। কেউ কেউ কাদা মাড়িয়ে বাহাদুরি দেখাতে সমুদ্রের জলসীমায় গিয়ে হাঁটুর ওপর ঢেউয়ের বাড়ি লাগাচ্ছে। ছোট ছোট ঢেউ এসে তাদের শাড়ির নিচের দিকটা হাঁটু পর্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে। তাদের সঙ্গী পুরুষেরা জুতো হাতে ডাঙায় শুকনো বালিতে দাঁড়িয়ে দেখছে। সূর্যাস্তের প্রাকৃতিক মোহকে উপভোগ করার একটা প্রবণতা কিংবা বলা যায় প্রস্তুতি আছে মানুষের মধ্যে। যা ক্ষণস্থায়ী তন্ময়তা এনে দিয়েছে এইসব নরনারীর মুখে। (আল, ১৯৯৭: ২৩)

আলোচ্য গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র বিপত্নীক রাসু জলদাসের সঙ্গে মানসিক বিকারগ্রস্ত বিধবা পুত্রবধূ কালীর দৈহিক মিলন, মিলনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া, বৈধ-অবৈধতার প্রশ্ন এবং এর যে সামাজিক দায় তার ঊর্ধ্বে নারী-পুরুষের জৈবিক কামনার যে পরাক্রমশালী রুদ্ররূপ, অপ্রতিরোধ্য চিত্তচাঞ্চল্য তারই অনবদ্য শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে। 'রাসু এবং কালীর আদিম ইন্দ্রিয়জ আবেগের রূপায়ণ আমাদের নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাকে নাড়া দেয়। আমাদের অভ্যস্ত চিন্তা ও মূল্যবোধের বিপ্রতীপে এ গল্পের অবস্থান।' (চঞ্চল, ২০১৬: ১৯৫) গল্পের কাহিনি ও ঘটনা পরম্পরাসূত্রে আমরা দেখি সামুদ্রিক ঝড়ে কালীর স্বামী দামোদর নিখোঁজ হয়ে যায় এবং দামোদরহীন কালীর অবচেতন মনে গুহায়িত যৌনকাঙ্ক্ষা সমুদ্রের জলের মেছো নোনতা গন্ধে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে লিবিডোতাড়িত কালীর অবচেতন মনে শ্বশুর রাসু আবির্ভূত হয় স্বামী দামোদররূপে এবং পুত্রবধূ কালীর নগ্নদেহ প্রত্যক্ষ করার পর রাসুর মনোজগতে কালী দেখা দেয় মৃত স্ত্রী সতীর রূপে। তাই রাসু যখন যৌনকাতর মুহূর্তে কালীর গলায় বুকে ঠোঁটের স্পর্শ দিতে দিতে বলে,

'তুই সতী, তুই সতী – তোর বুকে আমার সতীর গন্ধ। তুই সতী হয়ে যা কালী।' (আল, ১৯৯৭: ৩১) তখন "রাসুর শক্ত বাহুর পেষণে কালী একবার শুধু অস্পষ্টভাবে আওয়াজ তুলে উচ্চারণ করল, 'দামোদর'।" (আল, ১৯৯৭: ৩১) এখানে কালো নৌকা যৌনচেতনাতাড়িত রাসু-কালীর দেহ নৌকারই প্রতীক হয়ে উঠেছে। গল্পকার আল মাহমুদ অত্যন্ত সুচারুরূপে রাসু জলদাস ও পুত্রবধূ কালীর স্বাধীন শরীরী কামনাকে বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যারীতিতে বর্ণনা করেছেন এবং তাদের লিবিডোপ্রবৃত্তির সর্বগ্রাসীরূপ প্রতিফলিত করেছেন। কালীর শরীরের গন্ধ, চুলের গন্ধ, সাগরজলের নোনাগন্ধ ও শ্বশুর-পুত্রবধূর জৈবিক আলোড়ন প্রভৃতি বিষয়কে আল মাহমুদ শিল্পসফলতার সাথে তুলে ধরেছেন। গল্পের নামকরণও ইঙ্গিতবাহী। নৌকা ফ্রয়েডীয় চিন্তায় নারীর যৌনতার প্রতীক। সমগ্র গল্পে কালী একাধিকবার নৌকার সঙ্গে অভিন্ন হয়েছে। কালো শব্দে নিহিত রহস্যময়তা, খোলা চুলের তামসী এবং নৌকার চিত্রকল্প বারবার ফ্রয়েডের যৌনচেতনার কথা মনে করালেও নারীপুরুষ সম্পর্কের অনিবার্য যৌনতার তত্ত্বকে অতিক্রম করে গল্পে নরনারীর স্বতঃস্ফূর্ত জিজীবিষা জয়ীর মর্যাদা পেয়েছে। ফলে ভাব-ভাষা ও প্রকরণের নান্দনিকতায় আলোচ্য গল্পটি হয়েছে স্বকীয় ও অসাধারণ। বস্তুত লিবিডোচেতনার নতুন মাত্রা নির্মাণে 'কালোনৌকা' গল্পটি আল মাহমুদের শক্তি ও সৌন্দর্যের সাক্ষ্য বহন করেছে।

আল মাহমুদের গল্পে লিবিডোতাড়িত মানবমনের স্বপ্নচৈতন্যের বহুমুখিন ভূমিকা লক্ষ করা যায়। 'রোকনের স্বপ্নদোলা' এ ধারার একটি শিল্পসফল গল্প। আল মাহমুদ জাদুবাস্তবতার কৌশলকে খুব নিখুঁতভাবে এখানে তুলে ধরেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র রোকনের অবদমিত যৌন চেতনার জাগরণ ঘটে তার স্বপ্ননায়িকাদের সংস্পর্শে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজের অধ্যাপক রোকন তার স্ত্রীকে নিয়ে ট্রেনে চট্টগ্রামে বন্ধুর বাসায় যাত্রাকালে এক অলৌকিক অদ্ভুতুড়ে দৃশ্যের মুখোমুখি হয়। রোকনের স্ত্রী রোকেয়ার পাশে বসা অপরিচিত এক মহিলাকে তার চেনা মনে হয়। রোকনের স্মৃতিলোকে ভেসে ওঠে নূরজাহান, আরতি, কুসুমসহ আরো অনেক চেনা মুখ। তবে ট্রেনের সেই নারীই রোকনের সমস্ত চিন্তা-চেতনায় অধিকার করে বসেছে। রোকনের মানসলোক স্বপ্নের রাজ্যে বিচরণ করে:

> রোকন মনে মনে বলল। এখন তোমাকে আমার ভালো লাগছে। তোমার চোখ আভাময় হয়ে উঠেছে। তোমার ঠোঁট দৃঢ়তার বদলে কামনায় কাঁপছে। কে বলেছে তোমার নাকটা কদাকার? তোমার মাংসের মধ্যে যে ঢেউ বইছে তা কি আর ঐ শেওলার মতো ব্লাউজের আড়ালে চেপে রাখতে পারছ? না পারছ না। তোমার মাংসের দুটি ঢেউ আমি দেখতে পাচ্ছি। এখন তোমাকে আমার ভালো লাগছে। রোকেয়ার চেয়ে ভালো। আরতি, নূরজাহান, কুসুমের চেয়ে ভালো। (আল, ১৯৯৭: ৪১)

স্বপ্নের মধ্যে যৌনবিকারগ্রস্ত এক পুরুষের মনোভাবকে অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিমায় আল মাহমুদ এ গল্পে উন্মোচন করেছেন। স্বপ্নের মধ্যে যৌনবিকারগ্রস্ত রোকনের এ মনোভাব

থেকে ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্বের প্রসঙ্গ আলোচিত হতে পারে। ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্বের প্রত্যয় অনুযায়ী:

> স্বপ্ন তৈরির (Dream Formation) কাজটি দুটি ভিন্ন পন্থার দ্বারা প্ররোচিত হয়। কোনো ভিন্ন প্ররোচিত প্রবৃত্তিগত অবদমিত আবেগ (Instinctual Repressed Impulse) অর্থাৎ নির্জ্ঞান ইচ্ছা এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে নিদ্রাবস্থায় অহমের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে, অথবা আমাদের জাগ্রত অবস্থার কোনো কামনা, কোনো অবচেতন চিন্তার শৃঙ্খল তার সমস্ত আনুষঙ্গিক বিরোধী আবেগসহ, নিদ্রাবস্থায় কোনো নির্জ্ঞান উপাদানের কাছে থেকে শক্তি পেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। (পুষ্পা ও মানবেন্দ্র, ২০০৭: ৮৮)

আলোচ্য গল্পেও রোকনের চিত্তের অবদমিত ইচ্ছা, তার সংগুপ্ত কামনা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নের মধ্যে অধিক মাত্রায় ক্রিয়াশীল থেকেছে। তার দৃষ্টিতে সকল নারীই সমান, ভোগ ও কামনার বস্তু। এর বাইরে নারীর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই বলে তার বিশ্বাস। তাই সে সবাইকে নগ্ন দেখে – সে তার স্ত্রী হোক বা অন্য কোনো নারী হোক। আর এভাবেই রোকন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তার অবদমিত ইচ্ছাকে পূরণ করার চেষ্টা করে। গল্পটিতে স্বপ্ন, জাদু মিলেমিশে একটি অভিন্ন আবহ তৈরি করলেও পরিসমাপ্তিতে রোকনের মনের অন্ধকার অবদমিত প্রবৃত্তির অনুপুঙ্খ বর্ণনাই গুরুত্ব পেয়েছে। গল্পে নারীকে তার সত্তা ও আত্মাসহ একক স্বতন্ত্র করে দেখার মতো মন বা দৃষ্টি কোনোটিই রোকনের লক্ষ করা যায় না। নিজের স্ত্রী কিংবা পরস্ত্রী প্রত্যেককেই সে স্তন, যোনিপ্রদেশের আবহে দেখেছে। ফলে তার স্বপ্নের ভেতরে সেই কামনার উদগ্রতাই প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচকের ভাষায়:

> 'রোকনের স্বপ্নদোলা' আসলে ব্যক্তিমনে কাল্পনিক সুখের আবেদন সৃষ্টি করে। রোকনের সুপ্ত যৌনচেতনার জাগরণ ঘটে তার স্বপ্নের নায়িকাদের সংস্পর্শে। কিন্তু তার ফলে বাস্তব জীবন যে বিপর্যস্ত হয়, তা সে বুঝতে পারে যখন তার চেতনায় স্বপ্নের ঘোর কেটে যায়। তবু ক্ষণিকের পরাবাস্তব জগৎ যে কত সুখের, সে তা মর্মে মর্মে অনুভব করে। কেননা তার স্বপ্নের দোলা তাকে কল্পনার এক আনন্দময় জগতে যে রমণীয় বিহারের সুযোগ দেয়, তাতে কল্পনাহীন বাস্তব জীবন আঘাত হানতে পারে নি। (আজহার, ১৯৯৬: ৪৭০)

আল মাহমুদের গল্পে ব্যক্তির দৃশ্যমান অবয়বের অভ্যন্তরে যেহেতু সন্ধান করা হয় অন্তর্গত মানুষকে এবং এ খোঁজার প্রক্রিয়ায় তিনি বিচরণ করেন চরিত্রের সচেতন স্তর থেকে অবচেতন মনস্তত্ত্বে, ফলে ক্রমাগতভাবে তাঁর গল্পে দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন যেমন হয় তেমনি বাস্তবতা থেকে মুহূর্তেই তিনি প্রবেশ করেন ধরা-অধরার পরাবাস্তব জগতে। এ উল্লম্ফনধর্মিতা আল মাহমুদের গল্পে এনেছে এক বিশেষ শিল্পসিদ্ধি। 'রোকনের স্বপ্নদোলা' গল্পে রোকনের মনঃসংকট তীব্র প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উন্নীত হয় চৈতন্যের বিশৃঙ্খল স্তরে এবং বিকারগ্রস্ত অসরল দৃষ্টিকোণ-উৎসারিত বহির্বাস্তব গল্পের প্রান্তিক পর্যায়ে পরাবাস্তবের রূপ লাভ করে।

আল মাহমুদের গল্পে নরনারীর আতপ্ত কামনার বিবরণ, নগ্নতার মুহুর্মুহু চিত্র অঙ্কিত হলেও এসব রচনাকে অশ্লীল বলা যায় না, এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আল মাহমুদের স্পষ্ট উচ্চারণ:

> যতটুকু দেখেছি তাই লিখেছি। যেটা আমি আমার সমাজে দেখেছি তাই লিখেছি। আমি তো বানিয়ে লিখিনি কিছু। অশ্লীল হবে তখন যদি আমি বানিয়ে লিখি কিছু। আমি যদি মানুষের সেক্সকে উত্তেজিত করতে কিছু লিখে থাকি সেটা হবে অশ্লীল। কিন্তু আমি যা লিখেছি সেটা সেক্সকে উসকে দেয় না, সেক্সকে লজ্জিত করে। (উৎপল, ২০১৫: ২০৫)

আল মাহমুদের গল্পে প্রতিনিয়ত প্রতিভাসিত হয় যৌনতা; যৌনতার মধ্য দিয়েই তিনি মূর্ত করে তোলেন নরনারীর জীবনকে, তার বিস্তার ও গভীরতাকে। তাঁর কাছে যৌনতা নিছক কোনো বিষয় নয়। এ এক জীবনদর্শনও বটে। এ দর্শনের একদিকে রয়েছে প্রেম, অপরদিকে রয়েছে আধ্যাত্মিকতা। ফলে তাঁর গল্পে লিবিডো কখনো প্রেম, কখনো প্রকৃতি, কখনো আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির সূক্ষ্ম অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে তাঁর চরিত্ররা সব নির্মিত হয়েছে। আল মাহমুদ গল্পে তাই যৌনতার অনুষঙ্গে নরনারীর নগ্নতার স্বাভাবিক রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি সমস্ত পোশাক এবং মুখোশ উন্মোচন করে মানুষের অবচেতনকে নগ্ন করে দেখাতে চান। নিজেই একবার লিখেছিলেন:

> যৌনতার কোনো তৃপ্তি নেই। এ আগুন একবার দেহের ভেতর জ্বলতে দিলে সে সব কিছু পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। আমার একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, যৌনসুখের চেয়ে মহত্তর কোনো সুখ প্রাণিদের মধ্যে আল্লাহ সৃজন করেননি। (আল, ১৯৯২: ২৩)

সে কারণেই আল মাহমুদের গল্পে যৌনতা সহজেই নান্দনিক পরিসর গড়ে তুলেছে। ফলে তাঁর গল্প অশ্লীল নয় বরং জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক নিয়মের পথ বেয়েই অগ্রসর হয়েছে।

আল মাহমুদ গল্পে পুরুষ শিকারীর আনন্দ যেমন পর্যবেক্ষণ করেছেন, তেমনি নারীর পুরুষকে ছলাকলার শিকারে পরিণত করার কৌশলও নির্মাণ করেছেন। পুরুষ যখন শিকারী তখন তার অবলম্বন পেশির শক্তি আর নারী যখন শিকারী তখন তার আশ্রয় বাৎসায়নের কামকেলি। আল মাহমুদের 'জলবেশ্যা' গল্পে নারীর পুরুষ শিকারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। গল্পের বাস্তব ভিত্তি উল্লেখ করে এক সাক্ষাৎকারে আল মাহমুদ বলেন:

> জলবেশ্যা গল্পটি সত্য না হলেও এটা আমার দেখা একটা বাস্তব চিত্র। আমার নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আমি যা দেখেছি, তাই উঠে এসেছে গল্পটিতে। জলবেশ্যাদের আমি নিজের চোখে দেখেছি। কথা বলেছি। তারপরে লিখেছি ওদের নিয়ে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লালপুর গ্রামে মেঘনা নদীর পাড়ে জেলেদের পল্লী আমি দেখেছি। সেই সময় গল্পটি আমি লিখেছিলাম। (এম আবদুল্লাহ, ২০১৯: ৯৪)

'জলবেশ্যা' গল্পের স্থানিক পটভূমি মেঘনা পাড়ের পূর্বাঞ্চল – লালপুরহাট ও তৎসংলগ্ন জেলেপাড়া। লালপুরহাটে দলবদ্ধভাবে বাণিজ্য করতে আসে বেদেরা। বেদের মেয়েরা গ্রামে গিয়ে সাপ-নাচায়, শিঙা লাগায়, দাঁতের পোকা তোলার ব্যবসা করে। এ বেদেকন্যাদের একজন বেউলা সুন্দরী আলোচ্য গল্পের প্রধান নারী চরিত্র। লালপুরহাটের তরুণ দালালদের নেতা আবিদ বেপারী দালালির পয়সা নিয়ে রাতের অন্ধকারে হাট থেকে বেরিয়ে এসে একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে মেঘনার দিকে তাকায়। এরপর আবিদ বেপারী বেদের বহরটির দিকে চোখ মেলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে; যুবতী বেদেনীদের তীব্র আকর্ষণ তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আবিদ বেপারী নির্ভয়ে নৌকা ভাসিয়ে বেদের নৌকার বহরের দিকে এগোতে থাকে। সমগ্র বেদে বহর যখন আলো নিভিয়ে নিদ্রামগ্ন তখন জলবেশ্যার নৌকা জেগে থাকে নিশ্চল কালো চোখের মতো। সেখানে বেউলা সুন্দরী তার দেহের পসরা সাজিয়ে অপেক্ষমাণ। আবিদ নির্ভয়ে বেউলাকে সুখ সম্ভোগের প্রস্তাব দেয়। বেউলার রূপসুধা পান করার জন্য আবিদ ব্যগ্র হয়ে ওঠে। বেউলার রূপ সৌন্দর্য বর্ণনায় আল মাহমুদ একেবারেই স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল:

> পেট আর বুক দিয়ে হাঁটু আর উরতের ওপর চেপে বসায় পেছন থেকে তার পিষ্ট স্তন দুটির ফুলে ওঠা পর্যন্ত আবিদ বেপারী লোভাতুরের মতো দেখতে লাগল। যেন কোনো নায়রী নাওয়ের বালক মেঘনার বুকে আঁত্‌কা ভেসে ওঠা গাঙশুশুকীর সুডৌল বুকের এক অংশ দেখে ফেলে অবাক হয়ে মনে মনে ভাবছে, অমা মাছেরও আবার বুনি আছে। (আল, ১৯৯৭: ৫৯)

বেউলার শরীরী সৌন্দর্যে অভিভূত, অসহিষ্ণু ও আত্মসংবরণহীন আবিদ বেউলাকে জড়িয়ে ধরে। পরস্পর আলিঙ্গনমুহূর্তে বেউলার স্তনযুগল আবিদের মুখের কাছে ফলের মতো নুয়ে পড়ে থাকে। এরপর শুরু হয় দেহ বিকিকিনির অন্তরালে নারীর পুরুষ শিকারের ষড়যন্ত্র। গল্পে বেপারীর উপার্জিত অর্থের সবটুকু আত্মসাৎ করাই বেউলার লক্ষ্য ছিল। বেপারীকে শরীরের ঐশ্বর্যে তৃপ্ত করতে না পারলে তা সম্ভব নয়। সে মুহূর্তে মুহূর্তে চমক লাগিয়ে দেয় আবিদকে। তাকে সম্বোধন করে লখাই। তার সামনে ক্রম উন্মোচিত করে গ্রীবার চীনাহাঁসসুলভ বক্রতা, সুগভীর গিরিখাতের মতো বিভাজিকা আর গাঙশুশুকীর সুডৌল বুকের মতো স্তন। 'পুরুষ নারীর সৌন্দর্যের কাছে চিরকাল বঁড়শিতে গাঁথা নিরুপায় মাছের মতোই বিদ্ধ থেকেছে। বেশ্যা রমণীর কাছে পুরুষ যায় শুধুই রমণের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। আর রমণী পণ্য সাজায়।' (শ্রীপর্ণা, ২০১৭: ১৪৩) বেপারী বেউলাকে পঞ্চাশ টাকা দেয় নির্দ্বিধায়। বেউলা সেই টাকা রাখে ঘরের তিনটি সাপের ঝুড়ির একটির ভেতরে। বেপারীকে রসিকতার ছলে জানায় 'আমি হাপ পালি, আর মানুষ নাচাই।' (আল, ১৯৯৭: ৬২) বেউলার এ কথার নিহিত সত্যটুকু বেপারী বুঝে ওঠার আগেই সে নগ্নতার সৌন্দর্য নিয়ে বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে, বেপারীকে প্ররোচিত করে শাড়ির গিঁট খোলে। বেপারী শাড়ির গিঁট খুলতে গিয়ে তপ্ত নাভিমূলের মাদকতায়

ও কালো গুল্মময় ত্রিভুজাকৃতি ব-দ্বীপের মোহনায় সৌন্দর্য অবলোকনে আত্মবিস্মৃত হয়। গল্পকারের ভাষায় – 'আবিদের মনে হল যেন এক ফণা-মেলা সাপিনী তার ফণাসহ গর্তে ঢুকতে গিয়ে গর্তের মুখে আটকে থমকে আছে।' (আল, ১৯৯৭: ৬৩) দুজন অচেনা নারী-পুরুষের অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে গল্পের এ অংশে:

> কোমল স্পর্শে বেপারী বেউলার গম্বুজের মতো হাঁটুতে হাত রাখলে মেয়েটি অতিধীরে তার ভারী উরুযুগলের একটি ফাঁক করে দিল। যুগলের বাম স্তম্ভ জংঘার একপাশে আস্তে নেমে গেলে বেউলা তার ভাঁজ করা বাম পায়ের ভাঁজ খুলে পাটাতনের ওপর নিঃশব্দে স্থাপন করল। বেশ আরামের সাথে রাখল পা'টা। অন্য পা'টাও এভাবেই রাখবে ভেবে বেপারী অপেক্ষা করছে। কিন্তু স্তম্ভটা অনড়। বেপারী তার ডানহাতটা আবার স্তম্ভের চূড়ায় রাখতে গিয়ে বুঝল হাত কাঁপছে। ঠিক জালি লাউয়ের মোটা লতার মতো কাঁপছে। বেপারীর স্পর্শে বেউলা ঘুম জড়ানো ধানচেরা চোখ দুটি মেলল। বেউলা তার ডান উরু একটু ডানদিকে হেলিয়ে প্রসারিত করতে লাগল। তবে তা পাটাতনের ওপর না বিছিয়ে অকস্মাৎ তুলে দিল বেপারীর বিস্তৃত কাঁধের ওপর। পায়ের পাতা কাঁধ অতিক্রম করে গিয়ে সাপের ঝুড়ির ডালায় ঠেকল। বেপারী বেউলার এই উদার সম্প্রসারণে কৃতার্থ হয়ে তার ডান হাঁটুর পাশে ঠোঁট ঘষতে লাগলো। দরদর করে ঘাম ঝরছে আবিদের পেশিবহুল পিঠ আর বুকের পশম ভিজিয়ে। তার কোমরে মোটা ঘুনসির তাগাটা ভিজে আঁট হয়ে আছে। বেপারীর নগ্নতাও এখন শিল্পিত পাথরের মতো সুন্দর আর ঋজু। (আল, ১৯৯৭: ৬৩-৬৪)

আলোচ্য গল্পে সাপ হয়ে উঠেছে লিবিডোর প্রতীক। ফ্রয়েডের মতে সাপ পুরুষ যৌনতার প্রতীক। এ গল্পে এ-সাপই পুরুষকে নারী শিকারে প্রবৃত্ত হতে সহায়তা করেছে। তবে গল্পের ভেতরে আরেকটি বিপ্রতীপ দিকও আবিষ্কার করা যায়। পুরুষ নিজের যৌন কামনার চরিতার্থতা করতে গিয়েই সর্বস্বান্ত হয়েছে জলবেশ্যার চাতুর্যের কাছে। সাপের দ্যোতনায় এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই গল্পের শেষে মোহময়ী এবং লাস্যে ভরপুর বেউলা তার কালনাগিনী দ্বারা আবিদকে দংশন করায়। রূপজ মোহ দূর হওয়ায় আসল স্বরূপে ঠিক বেদে বেউলা প্রত্যাবর্তন করে। গল্পকার নারীর অতলান্ত রহস্যের স্বরূপ চিত্রণে বেউলা চরিত্রের এক সার্থক উপস্থাপনা এ গল্পে তুলে ধরেছেন। 'জলবেশ্যা গল্পে শারীরিক পতিতাবৃত্তির পাশাপাশি মানসিক পতিতাবৃত্তির দিকটিকেও লেখক সমানভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।' (শফিকুর, ২০১৩: ২০৬) "বিষয়বস্তু ও রচনারীতির গুণে 'জলবেশ্যা' আল মাহমুদের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির একটি।" (সায়েদা, ২০০০: ২০৯) ভাব-ভাষা ও শব্দের অপূর্ব কারুকাজে 'জলবেশ্যা' পুরুষের জৈব বাসনা চরিতার্থ-করণের প্রয়াসের একটি সফল গল্পরূপ বলা যেতে পারে।

আল মাহমুদের *পানকৌড়ির রক্ত* গ্রন্থের সর্বশেষ গল্প 'বুনো বৃষ্টির প্ররোচনা'তে মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন পরত অপূর্ব শিল্পকুশলতায় চিত্রিত হয়েছে। মানুষের মনের সংগুপ্ত চিন্তাসূত্রকে চরিত্রের দ্বৈত রূপের মধ্যে গল্পকার এখানে প্রকাশ করেছেন। মূলত মধ্যবিত্ত যুবক

মাহমুদের চিত্তবৈকল্যজাত আচরণ এ গল্পের মুখ্য বিষয়। অধ্যাপিকা স্ত্রী মরিয়মের অনুপস্থিতিতে স্বামী মাহমুদের গৃহপরিচারিকা জমিলার প্রতি তীব্র যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রসঙ্গটি আল মাহমুদ এ গল্পে তুলে ধরেছেন। এ গল্পে মাহমুদ জমিলার প্রতি অনুভব করে প্রবল আকর্ষণ, 'বর্ষণসিক্ত কর্মচঞ্চল পরিচারিকার সুগঠিত শরীর মাহমুদকে করে তোলে প্ররোচিত, উত্তপ্ত ও কামনাবিভোর।' (মো. মোস্তাফিজুর, ২০০৯: ১২৯) জমিলার প্রতি মাহমুদ কামনাজর্জর অন্তরভাবনায় থেকেছে বিবশ বিভোর। বর্ষণস্নাত দিনে জমিলা মাহমুদের চেতনালোকে এক অতৃপ্ত অনুভূতির জাগরণ সৃষ্টি করলে তৈরি হয় ভিন্ন বাস্তবতা; যে বাস্তবতায় মাহমুদ আবিষ্কার করে এক নতুন জামিলাকে:

> জমিলার বয়েস এই বৃষ্টিতে আর বোঝা যাচ্ছে না। বিশ? বাইশ? পঁচিশ? কে জানে কত। মেয়েটা তার বুক, কাধ আর পিঠের ওপর লেপ্টে যাওয়া নিজের পরনের সিক্ত শাড়িটা আলগা করে মাথার ওপর রাখল। তারপর ভেজা চুলের সাথে শাড়িটা দড়ি পাকানোর মতো পেঁচিয়ে চুলের পানি চিপ্‌তে লাগল। এ অবস্থায় তার কোমরের উপরার্ধ, মাথা পর্যন্ত বেশ বাঁধা হয়ে ঝুঁকে থাকায় তাকে শ্বেতপাথরের বৃষ্টিসিক্ত মূর্তির মতো লাগছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত অবিরল বর্ষণধারার মতো ভিজতে থাকায় পিঠ ও হাতের পেশিকে কঠিন মনে হচ্ছে। বুক দুটিকে মনে হচ্ছে ঝড়ের ঝাপটালাগা সিক্তডানা কবুতরের মতো। (আল, ১৯৯৭: ৭৬)

বৃষ্টিতে ভেজা জমিলাকে মাহমুদের কাছে মনে হয়েছে এক নিটোল যৌবনা রমণীর মূর্তি। তার অবচেতনা-অন্তর্গত লিবিডো জমিলাকে পাবার আকুলতায় হয়েছে সক্রিয় ও বলিষ্ঠ। ফলে মাহমুদের লিবিডোশাসিত মনোবাস্তবতার সঙ্গে জমিলার অন্তরঙ্গ উপস্থিতি গল্পে নিয়ে এসেছে ভিন্ন ব্যঞ্জনা। জমিলা এ গল্পে উচ্চবর্ণের না হয়েও তার রক্তমাংসময় প্রবল আকর্ষণের গুণে গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে। তার শরীরে কামজ ক্লেদের আবরণ থাকলেও মনের শুচিতায় সে পূর্ণ মানবীতে পরিণত হয়েছে। 'অনুভবের তীক্ষ্ণতা, হৃদয়বৃত্তির প্রাবল্য, মানবচিত্তের ক্রিয়াবৈচিত্র্য, ইন্দ্রিয়চেতনার অকপট শিল্পিত প্রকাশ আল মাহমুদের *পানকৌড়ির রক্ত* গ্রন্থের গল্পগুলোকে প্রাতিস্বিকতায় অনন্য এবং সুখপাঠ্য করে তুলেছে।' (হাসান, ২০১৭: ১৫৫)

সাতটি গল্পের সংকলন *সৌরভের কাছে পরাজিত*[৬] (১৯৮২) গ্রন্থের তিনটি গল্পে ফ্রয়েডীয় লিবিডোচেতনার ভিন্নমাত্রিক রূপ বর্ণিত হয়েছে। মনোবাস্তবতার কথাশিল্পী আল মাহমুদ মানুষের মনের গভীরে অন্তঃশীল ফল্গুধারার মতো যে চিন্তা-চেতনা নিয়ত প্রবহমান, তার নিরঙ্কুশ বর্ণনা এসব গল্পে পরিবেশন করেছেন। অসাধারণ শিল্পঋদ্ধ বর্ণনাভঙ্গিতে অধিকাংশ কাহিনিতেই নর-নারীর অন্তর্বাস্তবতার চমৎকার সমন্বয় সাধিত হতে দেখা যায়। 'মাংসের তোরণ' গল্পে লেখক লিবিডোতাড়িত দেহজীবী নারীর শরীরী অনুষঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশের অবয়বকে উপস্থাপন করেছেন। এ গল্পে এক শৌখিন পতিতার ক্লেদ-পঙ্কিল জীবনবাস্তবতা অঙ্কিত হয়েছে সুনিপুণভাবে। গল্পটির সঙ্গে প্রেমেন্দ্র

মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) বিখ্যাত গল্প 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' কিংবা সুবোধ ঘোষের (১৯০৯-১৯৮০) 'বারবধূ' গল্পের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এসব গল্পে জীবনের মূল স্রোত থেকে যারা সরে যায় বা সরে যেতে বাধ্য হয়, সেই বঞ্চিত শ্রেণির প্রতিনিধি নিষিদ্ধ পল্লির বারবিলাসিনীদের জীবনচিত্র অপূর্ব দক্ষতায় প্রমূর্ত হয়েছে। 'মাংসের তোরণ' গল্পে দেখা যায় মধ্যবিত্ত উদীয়মান স্থপতি আনজাম তার নারীসঙ্গহীন জীবনের স্বাদ চরিতার্থতার জন্য এক রাতে রমনা গ্রীন থেকে এক দেহজীবী নারী দিলারাকে তার বাড়িতে নিয়ে আসে। আনজামের মা দিলারাকে ছেলের বান্ধবী মনে করে সে রাতে নিজের কাছে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে দিলারা তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কেননা পতিতাবৃত্তির প্রাপ্ত অর্থে 'কাল তার ছেলে দুলুর স্কুলের ড্রেস কিনে দিতে হবে। একথা মনে পড়া মাত্রই দিলারার মধ্যে সজাগ হয়ে উঠল যুগপৎ এক বেশ্যা আর জননী।' (আল, ১৯৯৭: ৯২) অবশেষে দিলারা নানা কৌশল অবলম্বন করে আনজামের শয়নকক্ষে উপস্থিত হয় এবং তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে। দিলারা যখন তার সম্পূর্ণ নগ্ন শরীর নিয়ে আনজামের যৌনকাতর দৃষ্টির সামনে আবির্ভূত হয়, তখন আনজামের মনে হয়:

> স্থিরনিবদ্ধ চোখে দিলারার বিস্তৃত সবুজাভ নাভীমূলকে বাংলাদেশের মানচিত্র বলে মনে হল কিনা, কে জানে। কারণ সেখানে এককালের সন্তানধারণের ফাটল অর্থাৎ বলিরেখা সুস্পষ্ট থাকায় চিহ্নগুলো মাতাল চোখে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বা ধলেশ্বরী বলে ভাবা এখন আনজামের পক্ষে বিচিত্র নয়। (আল, ১৯৯৭: ৯২)

লিবিডোনির্ভর গল্পের ধারায় আল মাহমুদের প্রতীকপ্রীতি লক্ষণীয়। এ গল্পে প্রতীকতার অনুষঙ্গে লেখক প্রবেশ করেছেন স্বদেশভূমির শিকড়ে। দিলারার শরীরী আয়তন অতিক্রম করে বৃহত্তর বাংলাদেশের স্বরূপ অন্বেষণে আল মাহমুদের প্রতীকমনস্কতা অনবদ্য। দেহজীবী দিলারার শরীরী অবয়ব মাতৃময় হয়ে ওঠে; তার পতিতাসত্তার মধ্যে চিরন্তন জননীর প্রতিরূপ আবিষ্কার আল মাহমুদের এ গল্পে ভিন্ন আবহ এনে দিয়েছে। পতিতাজীবনের অসঙ্গতি চিহ্নিত করে গল্পকার তাদের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার দিক গল্পে চিত্রিত করেছেন সাবলীলভাবে। আসলে সমাজভিত্তি এবং হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় যন্ত্রণা-আর্তি-প্রত্যাশা – এ দ্বিবিধ স্রোতের দ্বন্দ্ব-বৈপরীত্য দিলারার মধ্যে অপরিমেয় শূন্যতা ও হাহাকার সঞ্চার করেছে। ফলে গল্পের সমাপ্তি অংশে দিলারার নিরবলম্ব অস্তিত্ব উন্মোচনের অনুষঙ্গে গল্পকার পরিবেশ ও পরিস্থিতিতাড়িত নারীজীবনের অন্তঃসারশূন্য জৈবনিক ও মানসিক অবস্থাকে বিন্যস্ত করেছেন।

প্রবল জীবনমুখী দৃষ্টি নিয়ে আল মাহমুদ গল্পে তুলে ধরেন নর-নারীর বিচিত্র সম্পর্কের চালচিত্র। আল মাহমুদ তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে রচনা করেছেন 'খনন' গল্পটি। ড্রেজারে যারা কাজ করে তাদের জীবন বিশেষ করে সুখানিদের জীবনযাত্রার কিছু দিক এ গল্পে উন্মোচিত হয়েছে। এখানে কথকের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে হুসনা ও সুখানি হাফিজের জৈবিক সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে। ড্রেজার চালক সুখানি হাফিজের অনিয়ন্ত্রিত

জীবন, মদের নেশা, নারীসঙ্গ ইত্যাদি গল্পে পরিবেশিত হয়েছে অসাধারণভাবে। এ গল্পে হাফিজ ও হুসনার ভালোবাসা হৃদয়নির্ভর নয়, শরীরনির্ভর। হৃদয়গত ভালোবাসাকে অতিক্রম করে তারা শারীরিক সম্পর্কে মেতে ওঠে। 'পরবর্তীকালে অসুস্থ হুসনার সেবায় হাফিজ রাত কাটায় নিদ্রাহীন। এবার তাদের সম্পর্কের ভেতর থেকে জেগে ওঠে দেহ নয়, লালসামুক্ত ভালোবাসার ঘ্রাণ। তারা অনুভব করে কামনাচঞ্চল শরীরের উষ্ণতা নয়, হৃদয়ের গভীরতর উত্তাপ।' (মো: মোস্তাফিজুর, ২০০৯: ১৬৯) মধ্যবিত্তের দেহগত ভালোবাসার শিল্পিত রূপ 'খনন' গল্পকে দিয়েছে বিরলস্বাতন্ত্র্য। নরনারীর মনোজাগতিক বাস্তবতা, তার বিকার ও বৈকল্য, অবচেতনার অন্তর্গত গোপন ব্যাধি, লিবিডো চেতনা এবং মানুষের রহস্যময় গহন মনোলোকের বিবিধ প্রান্ত রূপায়ণে আল মাহমুদ শিল্পনিষ্ঠ। ব্যক্তি কিংবা পরিবেশ, অন্তর্জগৎ কিংবা অবরুদ্ধ বাস্তবতার রূপায়ণে তিনি মূলত বিশ্লেষণে আগ্রহী। কিন্তু এ বিশ্লেষণে যাবার পূর্বে তিনি ঘটনার বা আখ্যানের বর্ণনায় প্রবেশ করেন। বর্ণনা তাঁর গল্পে বিশ্লেষণের পূর্বসূরি। বিরূপ সময় ও সমাজবন্দি মানুষের অন্তর্জাগতিক জটিলতা এবং তার অবচেতনার বহুভুজ রহস্যময় প্রবৃত্তির চিত্রণে আল মাহমুদ বরাবরই সক্রিয় থেকেছেন।

আল মাহমুদ লিবিডোতাড়িত মানুষের অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব চিত্রণে বেশ সার্থকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ ধারার একটি গল্প 'মীর বাড়ির কুরসিনামা'। আমাদের যাবতীয় ইচ্ছা ও উদ্যমের মূলে যে সক্রিয় যৌন প্রবৃত্তি, সেই যৌন আকাঙ্ক্ষার ফলেই সৃষ্টি হয় মানসিক বিকার। কাঙ্ক্ষিত সময়ে কামনার মানুষটিকে না পেলে ব্যক্তি নানাবিধ অপচারে জড়িয়ে যেতে পারে। ফলে দেখা দেয় হিংসা, বিদ্বেষ, অন্তর্দ্বন্দ্ব আর বিবিধ স্নায়বিক উত্তেজনা। আলোচ্য গল্পে মীরবাড়ির গৃহবধূ মুরশিদার অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষার অন্তর্গত ক্ষোভ ও বিদ্রোহ একজোড়া লাল মোরগ-মুরগির রতি বাসনার অনুষঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের এক অভিজাত মুসলিম পরিবারের দম্পতির যৌন অশান্তির বিভিন্ন দিক এখানে বর্ণিত হয়েছে। মীর বাড়ির ছোট ছেলে আশরাফের যৌন অক্ষমতা তার স্ত্রী মুরশিদাকে করেছে অসুখী। গল্পে তাদের দাম্পত্যজীবনের গভীর মর্মমূলে প্রোথিত অতৃপ্ত যৌনজীবনের নিগূঢ় যন্ত্রণা আল মাহমুদ পরিবেশন করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। লেখক মুরশিদার অতৃপ্ত যৌনজীবনের মনস্তাত্ত্বিক বিকার রূপায়ণে প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। গৃহপালিত একটি মুরগির সঙ্গে লাল মোরগ সঙ্গমে লিপ্ত হলে মুরশিদা তার স্বামীকে বলে:

> 'তোমার যেইডা ভালা লাগে হেইডা তো দিয়া দিকছি, পারো না, রাতাডা পারে। চাইয়া দেহো।'
> চিকন গলায় বলল মুরশিদা। যেন একটা সজারু কাঁটার ঝিলিক দিয়েই আবার গা ঢাকা দিল।
> স্ত্রীর কথায় আরশাফের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে সে বেশ একটু শব্দ করেই চেঁচিয়ে উঠল, 'চুপ কর হারামজাদী, তর জব্বর তেল অইছে।'

'অত জোরে কইও না। রাতাডা দেকলে তোমারে আবার ঠুকরাইয়া ভাগাইবো। আমি আলিমার মুরগিডার থিকা ভালোই আছি, বুঝলা?' (আল, ১৯৯৭ : ১৩৭)

বস্তুত এ গল্পে দাম্পত্যসম্পর্কে অসুখী এক নারীর মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম জাল বয়ন করেছেন লেখক। ফ্রয়েড ব্যক্তির সকল আকর্ষণের মূলে যে লিবিডোকেই একমাত্র কারণ বলে বিবেচনা করেছেন এবং লিবিডোই যখন নর-নারীর সম্পর্কের মূল চালিকাশক্তি, তখন মুরশিদার এধরনের কথোপকথন অসঙ্গত নয়। কেননা না পাওয়া দাম্পত্যজীবনের অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা মুরশিদার অন্তর্জগতে সৃষ্টি করেছে ক্ষোভ ও সংকট। এখানে মুরশিদার মোরগ-মুরগির সঙ্গমদৃশ্য অবলোকনের ফলে যে মনস্তাত্ত্বিক আচরণ প্রদর্শিত, তা ফ্রয়েডের অবচেতন তত্ত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মানুষের অন্তর্জীবনের চলচ্ছবি চিত্রণে আল মাহমুদ সর্বদা আগ্রহী ছিলেন। 'ফ্রয়েডের বিশ্ববিশ্রুত আবিষ্কারের পরে অন্তর্জীবনের রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। একালের গল্পলেখকেরা মানুষের সেই নিগূঢ় মনের গহনে তাঁদের সন্ধানী আলো ফেলেছেন।' (রথীন্দ্রনাথ, ১৯৫৯: ১৫৩) আল মাহমুদ তাই গল্পে মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চরিত্রের অন্তর্নিহিত হৃদয়াবেগকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি নিখুঁতভাবে তুলে এনেছেন মনোবিকারের চিত্রও। 'ঈভের ছায়া' গল্পে শোয়েবের লিবিডোতাড়িত মনোবাস্তবতা মনোবিকলনে পর্যবসিত হয়েছে। বস্তুত এ গল্পে পুরুষের বহুগামী রূপ শোয়েবের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও শোয়েবের অন্য নারী দরবেশ আপার প্রতি যৌন আকর্ষণ তার বিকৃত মানসিকতারই পরিচায়ক। গল্পের কাহিনি বিন্যাসে আদি মাতা 'হাওয়া'র প্রসঙ্গ আদম-ঈভের সেমিটিক মিথের সঙ্গে অভিন্নসূত্রে গ্রথিত। শোয়েব এবং সাদিয়ার দাম্পত্যজীবনে হঠাৎ আলোর ঝলকানি নিয়ে আবির্ভূত জনৈক দরবেশ আপার আবির্ভাব শোয়েবের মনস্তাত্ত্বিক আলোড়ন ও তার মনোবিকৃতির প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে দরবেশ আপার আকস্মিক আগমন এবং তার নিরাভরণ শরীর দর্শনের ভেতর দিয়ে শোয়েবের মনোবিকার তীব্র হয়ে ওঠে। তবে তার এ বিকৃতি ভিন্ন রূপ নেয় যখন সে দরবেশ আপার বোরখা উন্মোচন করে আবিষ্কার করে তার মৃত মাকে। গল্পে রহস্যময়ী দরবেশ আপার উপস্থিতি এবং তাকে দেখার জন্য শোয়েবের যে নিষিদ্ধ কৌতূহল সর্বোপরি তার অবচেতনা অন্তর্গত লিবিডো ভাবনার যে বহিঃপ্রকাশ তাতে গল্পকার আল মাহমুদের কাব্যময়তার প্রকাশ লক্ষণীয়:

এক অদম্য কৌতূহল শোয়েবের আবছা অন্ধকার ড্রইংরুমে থেকে ঠেলে ভেতরে ডাইনিং স্পেসের কাছে নিয়ে এল। এখানে অতটা অন্ধকার নেই। বাইরে কাঁচের শেডের উপর জোছনার আস্তর লুটিয়ে পড়ায় স্পেসটায় হালকা আলোর প্রতিবিম্ব আছে। শোয়ার ঘরের জানালাটা খোলা। শোয়েব সন্তর্পণে এক পা এক পা করে খোলা জানালার দিকে যায়। বিছানায় চাঁদের আলো পড়েছে বটে কিন্তু শয্যায় কেউ নেই। বিছানাটা শূন্য। শোয়েব ভালো করে ঘরের ভেতরটা এমনকি মেঝেটাও তালাশ করে হতবাক হল। দরবেশ আপা

> তাহলে গেলেন কোথায়? একটু কেমন যেন ভড়কে গেল শোয়েব।
>
> 'আমাকে খুঁজছেন? আমি আপনার পেছনে। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, আমি রাতে ঘুমোই না। কেন আমাকে খুঁজছেন? আমার চেহারা দেখার খুব সাধ হয়েছে? জানেন না বেগানা আওরতকে লুকিয়ে দেখা মহাপাপ?' (আল, ১৯৯৭: ৩১৮)

শোয়েব লজ্জায় চিৎকার করে মুখ ঢেকে চোখের সামনে স্ত্রী সাদিয়াকে দেখতে পেলে সে দরবেশ আপার হাত থেকে মুক্ত হতে সাদিয়ার কাছে সাহায্য চায়। মনোবিকলনধর্মী এ গল্পে শোয়েবের অন্তর্জীবনের সংকট উন্মোচিত হয়েছে নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততায়। স্বপ্ন ও মনোবিকলনের এক অনবদ্য নিরীক্ষাধর্মিতার সফল চিত্রায়ণ এ গল্পে 'শোয়েবের লিবিডোশাসিত মনোবাস্তবতার সঙ্গে আদি মাতা হাওয়ার উল্লেখের মধ্য দিয়ে লেখক সেমিটিক মিথের নিপুণ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।' (চঞ্চল, ২০১৬: ১৯৬)

'সামগ্রিক জীবন যৌনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, যৌনজীবন সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না।' (ধীরেন্দ্রনাথ, ২০০০: ৩৩২) কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি কেবল যৌনজীবন দ্বারা সমগ্র জীবনের ছক তৈরি করে তখন ভারসাম্যচ্যুত সে জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় অবধারিতভাবেই। 'নিলক্ষ্যার চর' গল্পের প্রধান নারী চরিত্র পতিতা মইষা প্রবলভাবে যৌন বিকারগ্রস্ত। কামাল, কালা ও তোরাব কর্তৃক তার দেহভোগের বিচিত্র লীলা এ গল্পের প্রধান বিষয়। পেশায় দেহ পসারিণী মইষা; পুরুষদের মনোরঞ্জনই তার লক্ষ্য। গল্পে তোরাব মইষাকে দত্তখলার ঋষি পাড়া থেকে মাসিক একশ টাকার বিনিময়ে ভাড়া করে নিয়ে আসে। মইষা কামাল ও কালাকে তাদের জৈবিক চাহিদা পূরণে তার পেশাদারিত্বের পরিচয় দেয় সার্থকভাবে। কিন্তু দলের সর্দার তোরাব বরাবরই নিজেকে মইষা থেকে আড়ালে রাখে। গল্পের অন্তিম মুহূর্তে তোরাব এক নাটকীয়রূপে আবির্ভূত হয় এবং মইষার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। তোরাব হাত বাড়িয়ে মইষার একটি নগ্ন বাহু ধরে বলে:

> তুই আগুনের মতো সুন্দর আর পানির মতো ঠাণ্ডা। আমি তরে লইয়া খালা ছাইড়া পলামু। রাকখালি ছাইড়া মাঝি অইয়া বাঁচুম। আমার এক মুই আছে গোকনঘাটে। তার জামাই কলের নৌকা চালায়। তরে লইয়া হিয়ানে যামুগা। আমিও চামার, চামারের অধম, তুই রাজি অইয়া যা। (আল, ১৯৯৭: ৩৮৩)

সর্দার তোরাবের এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হয় না মইষা। কেননা পতিতার ধর্ম পতিতাবৃত্তি; তাদের নির্দিষ্ট কোনো সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া সমীচীন নয়। সমাজে বহুভোগ্য এ নারীর জীবনসঞ্জাত উপলব্ধি উন্মোচিত হয় তার নিজস্ব প্রেক্ষণবিন্দুজাত ভাবনা থেকে:

> এইখানে পছন্দ অপছন্দের কথা নাই সর্দার। আমি বহু মাইনষের ঘাঁটা ময়লা, কাদা, আগুন না যেমন তুমি দেখতাছ। আমার মতো মাগিরে কেউ বিশ্বাস করে না। তুমিও করবা

> না! শখ মিট্যা গেলে আমার গতর থিক্যা পচা মাটির গন্ধ বাইরব। খাবলাইন্যা মাটির গন্ধ। কূলটা চামারনি কোনওদিন বউ অয় না। নেও দুধের উপর বগলাইয়া সর উঠতাছে। হাতা দিয়ে তুইল্যা দেই খাও। আমারেও খাও। বউ বানাইবার কথা কইয় না। আমি বউ অইবার খোয়াব দেখি না। বুঝলাম এইখান থিক্যা আমার ভাত উঠছে। আজ আমারে খাও। কাইল বিয়ানে আমি চইলা যামু। (আল, ১৯৯৭: ৩৮৪)

পতিতাজীবন নিয়ে রচিত এ গল্পে আল মাহমুদ তাদের বৃত্তিগত যন্ত্রণার বাস্তব চিত্র যেমন উন্মোচন করেছেন, তেমনি বিশ্লেষণ করেছেন নারীর পদস্খলন। তবে সবকিছুকে অতিক্রম করে 'নিলক্ষ্যার চর' গল্পে নারীর বহুগামিতার উর্ধ্বে তার মহৎ মানবিক রূপকে তুলে ধরেছেন আল মাহমুদ।

আল মাহমুদ কেবল নর-নারীর যৌন সম্পর্কের চিত্রই গল্পে তুলে ধরেননি কখনো যৌনতার আড়ালে বিকৃত যৌনাচার প্রসঙ্গও উপস্থাপন করেছেন। বিশেষ করে সমকামিতা তাঁর গল্পে প্রযুক্ত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক ভঙ্গিমায়। 'যদি নারী ও পুরুষ সমলিঙ্গের সঙ্গে রতি সুখ অনুভব করে, তাহলে অবশ্যই এই ধরনের জৈবিক সম্পর্ককে সমকামী সম্পর্ক বলা হবে। এই ধরনের সম্পর্ককে মনঃসমীক্ষণের ভাষায় 'বিকৃত' (Perversion) কামচেতনা বলে।' (জহর, ২০১৯: ৪৯) 'পুরুষ সুন্দর' গল্পে নারীর সমকামী জীবনচিত্র বর্ণিত হয়েছে। গল্পে তিন অবিবাহিত যুবতী মোনা, মাহবুবা ও মালতী ঢাকার একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে একত্রে বসবাস করে। তারা সবাই ব্যাংকে কর্মরত, বয়স পঁচিশের নিচে। এদের মধ্যে মাহবুবা ও মালতী শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত। যদিও মালতী পরবর্তী পর্যায়ে এ বিকৃত যৌনাচার থেকে বের হয়ে আসে। গল্পটিকে একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছড়িয়ে আছে এর পরতে পরতে। ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী – 'মুখ পর্যায়ে, পায়ু পর্যায়ে, আত্মসমগ্র শরীর প্রেমে, ঈডিপাসে, সমকামিতা পর্যায়ে ও শেষ পরিণামে বিপরীত লিঙ্গমুখী যৌন মানসশক্তি বা বিষমকামিতায় (Heterosexual) সুখ খোঁজে।' (পুষ্পা ও মানবেন্দ্রনাথ, ২০০৭: ১৯০) এ গল্পেও দেখি সমকামিতাকে পরিত্যাগ করে মালতী বিপরীত লিঙ্গের প্রতি তার স্বাভাবিক আচরণ প্রদর্শন করে। নারীত্বের গভীর উন্মোচনে সে ধীরে ধীরে নিজেকে উদ্ভাসিত করে তোলে; পুরুষই তার কাছে সুন্দর বলে প্রতিভাত হয়।

পুরুষের আদিম প্রবৃত্তি, নারী শরীরের প্রতি আকর্ষণ, তাদের ভোগ করার মধ্য দিয়ে যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় 'দৌড়' গল্পে। গল্পে দেখি একজন ক্রীড়া প্রতিবেদক দৌড়ের মেয়ে ময়নার সাক্ষাৎকারের জন্য তার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। আপত্তি সত্ত্বেও প্রতিবেদক জেনে ময়না তাকে সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হয়। সাক্ষাৎকার পর্যায়ে প্রতিবেদক যখন ময়নার কাছে দৌড়ের জন্য শারীরিক শক্তি আয়ত্ত করার কৌশল জানতে চায় তখন ময়নার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে সেই চিরসত্য কথা, 'দেখুন মেয়েদের দৌড় দেখতে যারা স্টেডিয়ামে জড়ো হয় তারা সবাই হলো পুরুষ, নয় কি?' (আল,

২০১১: ৫১৯) আত্মপ্রত্যয়ী ময়নার এমন বক্তব্যে জনৈক রিপোর্টারের আমূল পরিবর্তন গল্পের পরিণামি অংশকে করে তোলে নাটকীয়। গল্পে ময়নার দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের ভোগবাদী মানসিকতার স্বরূপ লেখক তুলে ধরেছেন:

> তারা কি দেখে। আমাদের দৌড় না। তারা দেখে নারীর প্রায়-উলঙ্গ মাসপেশি। এতেই তাদের তৃপ্তি। আর আমরা দৌড়ের মেয়েরাও জানি প্রথম হয় সে যার মাংসপেশি বেশি সতেজ। এই হলো আসল ঘটনা। আমার সম্বন্ধে কি লিখবেন তা আপনি জানেন। তবে আমি বলছি, আমি দেখতে ভালোই। এমনকি এই মুহূর্তে আপনার চোখ জ্বলজ্বল করছে আমাদের দৌড়ের মেয়েদের শারীরিক সৌন্দর্য দেখার জন্য। ঠিক নয় কি? (আল, ২০১১: ৫২০)

ময়নার এমন দৃঢ়তা আর স্পষ্টবাদী মনোভাবের পটভূমিতে প্রতিবেদক কোনো উত্তর না দিয়ে বাইরে চলে যায়; নিজেকে এই প্রথম রিপোর্টার হিসেবে খুবই তুচ্ছ মনে হয় তার। নৈঃসঙ্গ্যের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেতে অবচেতনের অন্ধ আবেগে তাড়িত হয়ে রিপোর্টার স্বগত কথনে বলে, 'মেয়েটির কুৎসা রটাব না। তার সাহসের প্রশংসা করে একটি রিপোর্ট তৈরি করব।' (আল, ২০১১: ৫২০) আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও গল্পটির মধ্যে এক গূঢ় সত্য লুকিয়ে আছে। আসলে নারী শরীর যে পুরুষের একমাত্র কামনার বস্তু, ভোগের বস্তু ময়নার কথায় তার প্রমাণ মেলে। আর এই ভোগের মধ্য দিয়েই তারা সুখানুভব করে। আল মাহমুদের গল্প কেবল আধুনিক নরনারীর এক ধরনের জলো পানসে সম্পর্কের কথাই বলে না, তাদের জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, লোভ-ক্ষোভ, পাপ-তাপ, জটিল-কুটিল, নানা ঘটনা, আদিম যৌনতা, হিংস্রতা, ক্ষমতার অধিকার, বিভিন্ন সমস্যা ও তার গূঢ় রহস্যের কথাও বলে। সে কারণে তাঁর গল্পের চরিত্ররা হয়ে ওঠে অনেক প্রকট, বাস্তবমুখী ও সমাজকেন্দ্রিক।

মানুষের মনোজগতের জটিল অতল প্রবৃত্তিলোক, সেখানকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মথিত হয়ে ওঠা প্রবৃত্তির তাড়না ও দুর্দমনীয় বিক্ষোভ, সংরাগ, কুণ্ডলায়িত আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ আল মাহমুদের আলোচ্য গল্পসমূহে এক বিশিষ্ট ও স্বকীয় মাত্রা এনে দিয়েছে। আধুনিক মধ্যবিত্ত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জটিল মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে মনস্তত্ত্বকে নানাভাবে প্রয়োগ করেছেন আল মাহমুদ। কেননা 'দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময় মনের জটিলতাই মনস্তত্ত্বমূলক গল্পের উপাদান।' (শিবশংকর, ১৯৯৯: ৬৬) তাই আল মাহমুদের এ ধারার গল্পে মনোবিকলনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে সার্থকভাবে। তাছাড়া গল্পের চরিত্রগুলোও অস্বভাবী আচরণ ও লিবিডো আক্রান্ত জটিলতায় ঘূর্ণমান। বলা যায়, নর-নারীর যৌনজীবনের নানা দিক উন্মোচন, তাদের মনস্তাত্ত্বিক সংকট এবং ব্যক্তিজীবনে লুক্কায়িত প্রবৃত্তির বহুমাত্রিক রূপ উন্মোচনে আল মাহমুদের গল্প বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করে।

টীকা

১. মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের জনক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের জন্ম ৬ মে, ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে, অস্ট্রিয়ার মোরাভিয়া প্রদেশের ফ্রাইবর্গে শহরে। ইহুদি রক্ষণশীল পরিবারে জ্যাকব ফ্রয়েড ও তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী অ্যামেনিয়া ফ্রয়েডের প্রথম সন্তান। কৈশোরকালে ফ্রয়েড মেধার পরিচয় দেন। জ্যাকব ফ্রয়েডের প্রথম পক্ষের চারটি সন্তান ছিল। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের বড় ভাইয়ের ছেলে ছিল তাঁরই সমবয়সী। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে সপরিবারে তাঁরা ভিয়েনা শহরে বাসস্থান বদল করেন। ১৮৬৫তে আবার তিনি এই শহরের পার্ল স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র সতেরো বছর বয়সে ভর্তি হন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। উদ্দেশ্য চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন শাখা নিয়ে পড়াশুনা করবেন তা তিনি দু-বছরেও স্থির করতে পারেননি। এই সময়ে কাপড় ব্যবসায়ী সৎ দাদার ইংল্যান্ডের বাড়িতে ভ্রমণের সময় তাঁর মনোজগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনাতে ফিরে আসেন। মানবদেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক নিয়ে গভীর অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকেন। অধ্যয়নকালে কলেজের শারীরতত্ত্বের অধ্যাপক আর্নেস্ট ব্রুকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, ব্রুকের অধীনে কেন্দ্রীয় স্নায়ু ব্যবস্থার গঠনতন্ত্র সম্পর্ক গবেষণা করা, চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি লাভ, গবেষণার কাজ ছেড়ে চাকরিতে যোগদান করা ইত্যাদি সব ঘটনা তাঁর জীবনে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়। (বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য: জহর এ. মণ্ডল, *মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১৯)

২. ফ্রয়েডের প্রথম গ্রন্থ *Aphasia* প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালে। এরপর প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থ, যেমন: *The Interpretation of Dreams* (1900), *Three Essays on the Theory of Sexuality* (1905), *Jakes and Their Relation to the Unconscious* (1905), *Character and Anal Erotism* (1908), *Contribution to the Psychology of Love* (1909), *Totem and Taboo* (1913), *Psychopathology of Everyday Life* (1913), *The Repression* (1915), *The Unconscious* (1915), *Metapsychology* (1915), *A General Introduction to Psycho-Analysis* (1920), *Group Psychology and the Analysis of the Ego* (1921), *Introductory Lectures on Psycho-Analysis* (1915-1922), *The Ego and the ID* (1923)

৩. আল মাহমুদ তাঁর আত্মজীবনী *বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ* গ্রন্থে নিজের নামের উল্লেখ প্রসঙ্গ লিখেছেন; 'আমার দাদা আমার নাম রেখেছিলেন মীর মোহাম্মদ আবদুস শোকুর আল মাহমুদ। আমি তা সংক্ষেপ করে আল মাহমুদ নামে লিখতে শুরু করেছি। আমার ডাক নাম পিয়ারু।' (আল মাহমুদ, *বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ*, আদর্শ, ঢাকা, পৃ. ২২৫)

৪. আল মাহমুদের প্রথম গল্পগ্রন্থ *পানকৌড়ির রক্ত* ঢাকার বর্ণমিছিল প্রকাশনী থেকে ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। পাঁচটি ছোটগল্প এতে অন্তর্ভুক্ত হয়। যথা: 'পানকৌড়ির

রক্ত', 'কালো নৌকা', 'রোকনের স্বপ্নদোলা', 'জলবেশ্যা' ও 'বুনো বৃষ্টির প্ররোচনা'।

৫. উল্লেখ্য আল মাহমুদের এই গল্পটি ফ্রান্সে অনূদিত হয়েছে। 'এশিয়া ওশেনিয়া' নামক আন্তর্জাতিক সংকলনে স্থান পেয়েছে 'কালো নৌকা' গল্পটি। এ সংকলনে বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে এই একটিমাত্র গল্প।

৬. আল মাহমুদের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *সৌরভের কাছে পরাজিত* ১৯৮২ সালে বইঘর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থভুক্ত সাতটি গল্পে আল মাহমুদ তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। গল্পগুলির নাম: 'মাংসের তোরণ', 'ভেজা কাফন', 'নীল নাকফুল', 'খনন', 'মীর বাড়ির কুরসিনামা', 'একটি চুম্বনের জন্য প্রার্থনা' এবং 'সৌরভের কাছে পরাজিত'।

গ্রন্থপঞ্জি

অচ্যুত গোস্বামী, ১৯৬৮। *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, পাঠভবন, কলকাতা।

আজহার ইসলাম, ১৯৯৬। *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আল মাহমুদ, ১৯৯৭। *গল্পসমগ্র ১*, অনন্যা, ঢাকা।

ইয়াহ্ইয়া মান্নান ও মো. তাজুল ইসলাম, ২০২০। *আল মাহমুদের ছোটগল্প : বিষয়ভাবনা*, পরিলেখ, রাজশাহী।

উৎপল ভট্টাচার্য, ২০১৫। *কবিতীর্থ* আল মাহমুদ সংখ্যা, কলকাতা।

এম আবদুল্লাহ (সম্পাদিত), ২০১৯। *মহাকালের কবি আল মাহমুদ*, মহাকাল, ঢাকা।

চঞ্চল কুমার বোস, ২০১৬। *বাংলাদেশের ছোটগল্প : জীবনজলধির শিল্প*, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা।

জহর এ. মণ্ডল, ২০১৯। *মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব*, *বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ*, কলকাতা।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ২০০০। *পাভলভ পরিচিতি*, কলকাতা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪০৫। *সাহিত্যে ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

১৪১০। *বাংলা গল্প বিচিত্রা*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা।

পুষ্পা মিশ্র ও মানবেন্দ্রনাথ মিত্র (সম্পাদিত), ২০০৭। *মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা*, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা।

মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, ২০০৯। *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৫৯। *ছোটগল্পের কথা*, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা।

শফিকুর রহমান, ২০১৩। *বাংলাদেশের গ্রামভিত্তিক ছোটগল্পে জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শিবশংকর পাল, ১৯৯৯। *সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানবিক মূল্যবোধ*, সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা।

শ্রীপর্ণা রায়, ২০১৭। *বাংলাদেশের গল্প : বাংলাদেশের গল্পকার*, শুভশ্রী, কলকাতা।

সায়েদা বানু, ২০০০। *বাংলাদেশের ছোটগল্পে বাস্তবতার স্বরূপ (১৯৭২-১৯৮৮)*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা।

সুনীলকুমার সরকার, ১৯৯০। *ফ্রয়েড*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

হাসান অরিন্দম, ২০১৭। *বাংলাদেশের সাহিত্য ও প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ*, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা।